...তর্কসভাতেও এই কথা শোনা গিয়াছে
...তাঁহারা দেখিয়াছেন, কীভাবে অজস্র
...নগঠন এবং গবেষণার প্রসার ঘটাইতে
...ছাত্রী বা গবেষকদের এককভাবে দোষী
...গুলি অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করাই
...থম কর্তব্য। বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিতর্কে
...তাঁহাদের মতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে
...ষ্য ব্যবস্থা থাকা জরুরি। এই অভিমতের

...কথা নয়। উচ্চশিক্ষায় ভর্তুকি দেওয়া
...বা অপব্যবহারের উপর নির্ভর করে না,
...কথা, ভর্তুকির পরিমাণ যথাসম্ভব কম
...গরের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ,
...অর্থ আদায় করিয়া তাহা এক শ্রেণীর
...স্য সরকারের ইচ্ছাধীন, সুতরাং ইহা
...হস্তক্ষেপ যত কম হয় ততই মঙ্গল।
...ভারতের মতো দেশে তাহার প্রথম
...শক্ত না হইলে পৃথিবীর বৃহত্তম শিক্ষিত
...ত নাই, তাহার প্রমাণ ভারত নিজেই।
...নিয়োগ করা দরকার অবিলম্বে, যদিও
...রুরি। উচ্চশিক্ষায় অনাবশ্যক সরকারি
...করা দরকার। শিক্ষা বা গবেষণার
...জন্য বৃত্তি দান—এ সকল কিছু ব্যয়
...ইকারি ভর্তুকির রীতি এবার রদ হোক।
...হইবে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড়
...কিন্তু তাহাতে আখেরে ছাত্রছাত্রীদেরই
...সংগ্রহের বা সময় কাটানোর অথবা
...কাহিলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি উচ্চশিক্ষার।

...সালে সেই রীতিরও জয়জয়কার। এ
...বুকার প্রাইজে সম্মানিত ইংরাজি
...উপন্যাসটিও ওই কায়দাতেই লেখা। লেখিকা
...শ্রীমতী এ. এস. বায়াট সোজাসুজিই জানিয়ে
...রয়েছেন যে তাঁর এই উপন্যাসটিতে
...'পজেশন') তিনি দুজনের উপন্যাসের (এবং
...যথারীতি) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।
...মবের্তো একোর 'দ্য নেম অব দ্য রোজ' এবং
...জমস ফওলস-এর 'ফ্রেঞ্চ লেফটেনান্টস
...ওম্যান'। বায়াটের উপন্যাসটি দুই
...তরুণ-তরুণী গবেষকের কাজকর্ম নিয়ে লেখা।
...দের অন্বেষণ এমন এক ভয়ঙ্কর সত্যের দিকে
...গোচ্ছে, যা পণ্ডিতদের সমাজে কেলেঙ্কারি
...ও ঘটায়। উপন্যাসটি নিয়েও পণ্ডিতমহলে
...আপত্তি ছিল। ক্লাস টেনের ছেলের লেখা
...-মডার্ন শৈলী ইত্যাদি কটুকথা বুকার
...প্রাইজ ঘোষণার আগে বিলেতের টেলিভিশন
...আলোচনাচক্রে এক কেমব্রিজ-পণ্ডিত এই
...উক্তিটি করেছিলেন।
...র প্রশ্ন এই, পোস্ট-মডার্ন কথাটার আসল
...নে কী? আধুনিক-আধুনিকতা?
...উত্তর-আধুনিকতা? মানে, ফজলিতর আম?
...নিকতা এ ধরনের সন্দেহই প্রকাশ করেছেন
...সালে সাহিত্যে নোবেল লরিয়েট
...অক্তাভিও পাস। স্টকহলমে বর্ষশেষে এক
...তায় তিনি বলেছেন, আধুনিকতা শব্দটাই
...একটা হেঁয়ালি। দুনিয়ায় সমাজ যত ...
...আধুনিকতাও তো ততরকমই। প্রত্যেকেই ...

এই শহর

কলকাতা সকলের শহর। নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এ মহানগরকে আপন করে নিয়েছেন যেমন, পার্সি, আর্মেনীয়, চিনা, ইহুদি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। তাঁদের নিয়ে একটি সমীক্ষা।

প্রাচ্যের মানুষ চিনারাও গত কয়শতকে লক্ষণীয়ভাবে ইংরেজি ভাষা, পোশাক এমনকি খ্রিস্টান ধর্মকে আপন করে নিয়েছেন। পার্সিদের 'অ্যাংলিসাইজেশন' তো আজ সুবিদিত। অথচ এই পাঁচসম্প্রদায়ের অনেকেই আলাদা আলাদাভাবে কট্টরভাবে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে আছেন। অতীতের প্রাধান্য পেছনে পড়ে রয়েছে এঁদের অনেকেরই। তবুও এঁদের জীবনযাত্রা কলকাতার সাধারণ মানুষের আগ্রহ জাগায়।

ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে, যখন এ শহর ছিল কার্যত দু'রকমের—দক্ষিণের 'সাদা' অর্থাৎ সাহেব অধ্যুষিত, আর উত্তরের 'নেটিভ' অর্থাৎ দেশীয় কালা আদমিদের কলকাতা—তখন এই পাঁচ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই কমবেশি দখল করেন দুই কলকাতার ঠিক মাঝখানের অংশটুকু। মধ্য কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকার এই কসমোপলিটান চেহারা আজও টিকে রয়েছে। ট্যাংরা অঞ্চলের শক্ত জমি এককালে চিনাদের চামড়ার ব্যবসা বাড়াতে সাহায্য করেছিল; আজ সে সব এলাকাই হয়ে উঠেছে দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ।

কলকাতার মূল মূল জীবনধারার সঙ্গে এই পাঁচ সম্প্রদায়ের মানুষেরা কতখানি মিশে বা দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন এবং কলকাতা সম্পর্কে এঁদের অনুভূতি ও সচেতনতা কতখানি—এ তথ্য জানাই এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

এর জন্য তৈরি করেছিলাম কয়েকটি প্রশ্ন; আপাতনিরীহ, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মজারও কিছু তার মধ্যে থেকে উত্তরদাতাদের মনের ভাবটি পরিষ্কার বোঝা যাবে। পুরো প্রশ্নমালা এখানে আর তুলে ধরছি না, শুধু আমাদের প্রয়োজনের অংশটুকু নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি।

মোট আড়াই শ জনের উত্তর যাচাই করেছি এই সমীক্ষায়। সাকলাত হল বা পার্সি ক্লাবের পার্সি সম্প্রদায় সাদর অভ্যর্থনা করেছেন, আবার ট্যাংরা বা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনা পরিবার সুন্দেহের বশে মুখ যে বুজেছেন তা আর খোলাতে পারিনি।

মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে পার্সিদের সংখ্যা কিছু বেশি, পঁচানব্বই জন। শহরের জনসংখ্যাতেও এঁদের ওজন তুলনামূলকভাবে বেশি। বাকিদের মধ্যে আর্মেনীয় পঁয়তাল্লিশ জন, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চল্লিশ, ইহুদি পঁয়তাল্লিশ, এবং চিনা মাত্র পঁয়ত্রিশ।

ইহুদিদের মধ্যে আঠেরো বছরের নীচে ছিলেন শতকরা মাত্র বারো ভাগ; ছত্রিশ থেকে উনষাটের মধ্যে এবং ষাটের ওপরে আরও চুয়াল্লিশ ভাগ করে। মধ্যের আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের গোষ্ঠীতে একজনও না, হয়তো এই বয়েসের অনেকেই কলকাতা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন বলে।

একজনের মুখেও শুনি নি তাঁর মাতৃভাষা হিব্রু; বরং প্রত্যেকেই ইংরেজিকে মাতৃভাষা মনে করেন। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে শতকরা তেত্রিশ ভাগ বাড়িতে হিন্দিতে কথা বলেন, বাকিরা অনেকে ইংরেজিতে। কর্মক্ষেত্রে শুধু ইংরেজি ... নিযুক্ত। ... নিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। মোট উত্তরদাতার শতকরা বাইশ ভাগ অবিবাহিত বা বর্তমানে একা রয়েছেন। যাঁরা বিয়ে করেছেন তাঁদের সাতষট্টি ভাগ নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহিত। এক ছাপান্ন শতাংশ স্কুলের পড়া শেষ করেছেন, কিন্তু গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পর্যন্ত পড়েছেন মাত্র বাইশ ভাগ করে। শতকরা তেত্রিশ ভাগের আয় মাসে পাঁচহাজারি টাকার ওপরে; আবার মাসে এক হাজারেরও কম আয় করেন আরও তেত্রিশ ভাগ। বাকিরা পড়েন চার থেকে পাঁচ হাজার মাসিক আয়ের দলে। এখানে বলে রাখি—পাঁচ হাজারের ওপরে কারুর কারুর মাসিক আয়ের অঙ্ক কুড়ি-তিরিশ হাজার পর্যন্তও পৌঁছেছে। পুরুষদের মধ্যে একাত্তর ভাগ রোজগার করছেন; তবে মহিলাদের মধ্যে মাত্র তেত্রিশ ভাগ রোজগারে।

ইহুদি উত্তরদাতাদের মধ্যে নিজেদের ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বস্ততা লক্ষ করলাম। উনআশি শতাংশ যুক্ত আছেন শহরের সিনাগগ দুটির কোনও না কোনওটির সঙ্গে।

উত্তরদাতাদের আটাত্তর ভাগই এক পুরুষেরও বেশি কলকাতায় আছেন। নিজের দেশ হিসেবে ইজরায়েলকে চিহ্নিত করেননি একজনও এবং সেখানকার সঙ্গে এঁরা তেমন কোনও সম্পর্ক রাখেন না। জোসেফ, একজন ধর্মান্তরিত ইহুদি, জানালেন তিনি ইজরায়েলে গেছিলেন কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে রেখেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বাঙালি-শরীরে সেখানকার তীব্র জলবায়ু সয়নি। জোসেফের নিজের ভাষায় ... কোনও এটাচমেন্ট নাই ...।

আর্মেনীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য রয়েছে ফিলানথ্রপিক কলেজ, কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। এখানে লেখাপড়ার জন্য দূর দূর দেশ থেকে অজস্র ছেলেমেয়ে এ শহরে এসেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে তাই আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের গোষ্ঠীই প্রধান—শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন। মোট সমীক্ষিত মানুষের মধ্যে ষাটের ওপরেও ছিলেন শতকরা চৌত্রিশ জন—যাঁদের বেশির ভাগই কলকাতার পুরনো বাসিন্দা।

উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা উননব্বই ভাগের মাতৃভাষা আর্মেনীয়, বাকিদের ইংরেজি। বাড়ির বাইরে তাঁরা কথা বলেন প্রধানত ইংরেজি (৫৮%) অথবা বাংলায় (২৩%), কিংবা ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি তিন ভাষাতেই। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান ভাষা অবশ্যই আর্মেনীয়। আর্মেনীয়দের এক-তৃতীয়াংশ করে রয়েছেন চাকরি ও ব্যবসায়ে, এবং বাকিদের মধ্যে রয়েছে ছাত্রছাত্রী বা অবসরপ্রাপ্তেরা। মহিলারা সাধারণত রোজগেরে নন—তা সে যে-বয়েসেরই হোন না কেন। আয়ের অঙ্কগুলোও বেশ উঁচুর দিকে; কেবলমাত্র এগারো শতাংশ মাসে এক হাজারেরও কম রোজগার করেন, বাকিদের মধ্যে বেশির ভাগই মাসে চার হাজারের ওপরে।

মোট উত্তরদাতার ছাপান্ন শতাংশ অবিবাহিত—সাধারণত অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা—বাকিদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করেছেন।

বড়দের মধ্যে স্কুল তো বটেই, কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছেন অনেকেই—সুতরাং শিক্ষাদীক্ষার সাধারণ মান বেশ উঁচু বলা চলে। ধর্মের দিক থেকে আর্মেনীয়রা বেশ গোঁড়া; মোট উত্তরদাতাদের সাতষট্টি শতাংশ নিয়মিত গির্জায় যান। কলকাতায় আর্মেনীয় চার্চের বয়েস প্রায় শহরের সমান, তবুও এর রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত মন্দ নয়। চার্চ-স্কুল-কলেজের পরিচালনায় রয়েছেন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা, আর এগুলি অত্যন্ত সুসংগঠিত।

শতকরা বাহান্ন জন কলকাতার সঙ্গে পরিচিত এক পুরুষেরও বেশি কাল ধরে, বাকিরা এখানে এসেছেন পড়াশুনো করতে ইরান-ইরাক প্রভৃতি দেশ থেকে। এঁরা পড়াশুনোর শেষে ফিরে যাবেন নিজের দেশে, ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি এরকমই। আর্মেনীয়দের ছাপান্ন শতাংশই তাঁদের মূল দেশের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন না, ... মাঝে মাঝে বেড়ানো বা বন্ধু-আত্মীয়ের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান-এ স্তরেই মাতৃভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। যদিও আর্মেনীয়ার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে এখনও অনেকের চোখে জল আসে, তবুও আটাত্তর শতাংশই জানান যে কলকাতা শহরে তাঁরা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ মনে করেন নিজেদের।

এখানে সমীক্ষিত পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে চিনাদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে। প্রথমে তো মুখ খুলতেই চাননি অনেকে; জবাবগুলোর মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব প্রকট। নানাভাবে 'ব্যাকচেক' চালানো সত্ত্বেও মনের খটকা দূর করতে পারি নি। উত্তরদাতাদের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের দলে; এর প্রধান কারণ অন্যান্য বয়ঃগোষ্ঠীর সদস্যদের উত্তর দেবার অনিচ্ছে। শতকরা সত্তর ভাগই ব্যবসায়ে রয়েছেন; বাকিরা চাকরিরত ও ছাত্রছাত্রী। ষাট ভাগ বিবাহিত; সকলেই নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে। শতকরা আশি ভাগ উত্তরদাতা স্কুলের পড়াশেষ করে আর ওপরদিকে যান নি; লেখাপড়ার মাধ্যম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজি ও চিনা।

উত্তরদাতাদের চল্লিশ শতাংশের মাসিক আয় তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে; আরও ঊনষাট শতাংশ দুই থেকে তিন হাজার পর্যন্ত মাসে আয় করেন। মেয়েদের শতকরা ছেষট্টি ভাগ কর্মরতা।

পুরনো বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে মাতামাতি চিনাদের মধ্যে কম; খ্রিস্টান ধর্মান্তরিতের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। তবে শুধু ইংরেজিঘেঁষা নাম ব্যবহার করছেন অথচ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নি, এমন উদাহরণও প্রচুর। উত্তরদাতাদের শতকরা ষাট ভাগ কোনও না কোনও ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সমীক্ষিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অর্ধেক ছিলেন ছত্রিশ থেকে উনষাটের মধ্যে; আরও আটত্রিশ ভাগ ছিলেন আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। এঁরা প্রত্যেকেই ইংরেজিকেই মাতৃভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উত্তরদাতাদের অষ্টআশি ভাগ চাকরিরত; বাকি বেকার বা ছাত্র। প্রায় তেষট্টি শতাংশ অবিবাহিত বা ডিভোর্সি। বিয়ে করে থাকলেও অধিকাংশই নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করেছেন; তবে তাঁদের পরিবারের কেউ না কেউ অন্য সম্প্রদায়ে বিয়ে করেছেন তা সে এদেশেই হোক বা বিদেশে।

স্কুল পর্যায়ের পরে পড়াশুনো করেছেন মাত্র বাইশ শতাংশ যদিও সমীক্ষিত সকলেই সাক্ষর। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সম্প্রদায় সবচেয়ে পেছিয়ে আছে; অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরই আয় মাসে দু'হাজারের কম। মেয়েদের মধ্যে কর্মনিযুক্তির অনুপাত অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি; শতকরা একচল্লিশ ভাগ মহিলা কোনও না কোনও অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

কলকাতার পার্সি সম্প্রদায় আয়তনে বোম্বাইয়ের পার্সি গোষ্ঠীর চেয়ে ছোট, শহরের অর্থনীতিতেও এঁদের গুরুত্ব কম। কলকাতার অন্যান্য ছোট সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে এখানকার পার্সি গোষ্ঠী অনেক বেশি সুসংগঠিত ও দলবদ্ধ। এঁদের বেশির ভাগই ইরান থেকে বহুযুগ আগে ভারতের উত্তর পশ্চিম উপকূলে, বিশেষত, গুজরাতে, এসে পৌঁছেছিলেন। ফলে চুরাশি শতাংশই গুজরাতিকে মাতৃভাষা হিসেবে গণ্য করেন। মোট পার্সিদের আটষট্টি ভাগ চাকরিতে নিযুক্ত, একুশ ভাগ ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং এগারো শতাংশ ছাত্রছাত্রী, কর্মহীন বা অবসরপ্রাপ্ত।

চাকরিই হোক বা ব্যবসা—পার্সিদের আয় অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশ উঁচুর দিকে। মোট পার্সিদের বেয়াল্লিশ ভাগ মাসে পাঁচ হাজারের ওপরে রোজগার করেন। আরও একুশ ভাগ আছেন তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে।

পার্সি উত্তরদাতাদের মধ্যে সাঁইত্রিশ শতাংশ করে রয়েছেন গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট; বাকি ছাব্বিশ শতাংশ স্কুল পাশ করেছেন। সুতরাং লেখাপড়ার মান বেশ উঁচুর দিকেই।

সাতচল্লিশ শতাংশ পার্সি নিয়মিত, এবং তিপান্ন শতাংশ মাঝে-মাঝে ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। উত্তরদাতাদের মাত্র বাইশ শতাংশ কলকাতা শহরে জন্মেছেন, যদিও বাকিদের মধ্যে আটষট্টি ভাগই জন্মস্থানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন না।

নিজের এলাকা ও কলকাতা শহর সম্পর্কে এই পাঁচটি ছোট সম্প্রদায়ের সচেতনতা মাপার জন্য কয়েকটা মজার প্রশ্ন রেখেছিলাম এঁদের সামনে। জানতে চাইলাম উত্তরদাতার বাড়িতে যে লোকটি রোজ খবরকাগজ দিয়ে যায় তার নাম, পাড়ার যে কোনও একটি ছেলের নাম, তাঁর প্রতিবেশীর নাম, পাড়ার কোনও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির নাম। কলকাতায় তাঁর সম্প্রদায়ের নেতার নাম, এবং কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার নাম।

ইহুদিদের মধ্যে নিজের পাড়া, নিজের সম্প্রদায় ও কলকাতা শহরের বিষয়ে সচেতনতা যথেষ্ট বেশি। মোট উত্তরদাতার শতকরা চৌষট্টি ভাগই কিন্তু তাঁদের ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত করপোরেশন-কাউন্সিলারের নাম বলতে পারেন নি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এককালে এই সম্প্রদায় কলকাতা শহরের সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতেন, কর্পোরেশনেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সদস্যসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে কেন এ শহর পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহও কমে গেছে। আর্মেনীয় উত্তরদাতারা প্রায় সকলেই নিজের সম্প্রদায়ের নেতার নাম জানেন অথচ সে তুলনায় মেয়রের নাম, এমনকি রোজকার খবরকাগজওয়ালার নাম জানার অনুপাত খুব কম। চিনাদের অধিকাংশ নিজেদের এলাকা, নিজের প্রতিবেশী বা সম্প্রদায়ের নেতার নাম জানেন কিন্তু কাউন্সিলারের নাম করতে পারলেন না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরও অনুরূপ অবস্থা। একমাত্র পার্সিদের মধ্যে এ শহর সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা বেশ উঁচু। খবরকাগজ-পত্রিকায় কলকাতা বিষয়ে সাম্প্রতিক লেখালেখির একটা ভাল ফল হয়েছে; কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জোব চার্নকের নাম করলেন প্রায় প্রত্যেকেই।

এসব সম্প্রদায়ের সদস্যরা কলকাতার ও পারস্পরিক জীবনে কতখানি অংশ নেন তা বোঝার জন্য জানতে চেয়েছিলাম শহরের সাধারণ মিটিং-মিছিলে তাঁরা যোগ দেন কিনা, এবং তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের সভ্য কি না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে যোগদানের অনুপাতই বা কেমন।

নিজের সম্প্রদায়ের এরকম বড় মিটিং হলে তাতে যোগ দেন পঁচাত্তর শতাংশ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এবং ছাপ্পান্ন শতাংশ করে ইহুদি ও পার্সি উত্তরদাতা। চিনারাও মোটামুটি (৪০%) যোগ দেন নিজেদের এলাকার সাধারণ মিটিং-এ।

নেমন্তন্ন রেখেছেন; প্রায় অর্ধেকজন্মদিন, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধে উপস্থিত থেকেছেন। সমস্ত উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি একবাক্যে জানান বর্তমানে এধরনের আন্তঃসাম্প্রদায়িক মেলামেশার সুযোগ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। এতজনের মধ্যে একজনও কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। আর শহরের রাজনৈতিক জনসভা বা মিছিলেও এঁরা কেউই তেমন যোগ দেন না।

সবশেষে প্রশ্ন ওঠে সংখ্যাভারক্লান্ত এই দীর্ঘ সমীক্ষার থেকে কী পেলাম?

আমার ধারণা হল নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলা সত্ত্বেও এই সমীক্ষার উত্তরদাতা প্রায় সকলে শহরের বাকি জনসমূহের সঙ্গে মোটের ওপর খাপ খাইয়ে চলতে পারছেন। কর্মক্ষেত্রে তো বটেই, সামাজিক মেলামেশার জগতেও বেশ কিছুটা সামঞ্জস্যসাধন ঘটেছে। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য লক্ষণীয়ভাবে কম। তবে আশার কথা এই যে, বেশির ভাগ উত্তরদাতাই মনে করে আগের চেয়ে মেলামেশার ক্ষেত্রগুলো চওড়া হচ্ছে; ভবিষ্যতের পক্ষে এটা আশার ইঙ্গিত বয়ে আনছে।

কলকাতা সম্পর্কে অনুভূতি ও সচেতনতা নির্ভর করেছে প্রতিটি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ইতিহাস ও উত্তরদাতার নিজস্ব অর্থনৈতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর।

কলকাতা শহরের জনজীবনের নানা বিষয় নিয়ে আপনার-আমার মতো এঁরাও কখনও কখনও অসন্তুষ্ট, তবে সেই বিরক্তির সঙ্গে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কলকাতা সম্পর্কে অনুভূতির সরাসরি সম্পর্ক বেশি। একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মাত্রেই সমুদ্রপারের 'হোমে'র দিকে চেয়ে রয়েছে সতৃষ্ণ নয়নে—এই চিরাচরিত ভাবনাকে সমর্থন করার মতো কোনও তথ্য এই সমীক্ষায় পাইনি। আমার ধারণা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে কলকাতার বিষয়ে সন্তোষ বা অসন্তোষ ব্যক্ত হওয়ার লক্ষণ বেশি, এবং তা যে কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য হবে।

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করে লাভ নেই। তবুও সর্বদা মনে রাখতে হবে, শহর কলকাতার বাসিন্দারা অর্থনৈতিক বিচারে নানা ধাপে রয়েছেন, এবং আমাদের সমীক্ষিত মানুষেরা সেই বিপুল জনগোষ্ঠীর একটা ক্ষুদ্র অংশ হলেও এই বিভেদের মূল বিষয়গুলো এঁদের সম্প্রদায়েও লক্ষ করার মতো।

তাই কলকাতা বিষয়ে এসব ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অনুভূতিগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণীর মতামতের প্রতিফলন, যদিও সম্প্রদায়গত ইতিহাসকে সবসময়ে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলে না।

ইহুদিরা নিজেদের পূজা-পার্বণে (ইয়ম কিপার)

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত